বাল্মীকীয় রামায়ণ ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

যাঁর কৃপায় মূক অর্থাৎ বধির লোক বাগ্মী হয়ে ওঠেন এবং কোন পঙ্গু ব্যক্তি পাহাড় অতিক্রম করতে সক্ষম হন, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি সর্বদা বন্দনা করি। কারণ ঈশ্বরের কৃপা ব্যাতিরেক মনুষ্য তথা জীবজগতের পরিত্রাণ নেই। এই পৃথিবীতে মানুষ, জীব-জন্তু, প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র। এমনকি একই প্রজাতির মানুষের মধ্যেও রয়েছে কতই না বৈচিত্র। বৈচিত্র বিরাজ করে যেকোন মানুষের স্বভাবে, মননে ও মানসিকতায়। আবার কখনও বা বৈচিত্র দেখা যায় মানুষের শারীরিক, মানসিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনে। মানবসমাজের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের উপস্থিতি সমানভাবে লক্ষিত হয়। তাঁদের এই অঙ্গবৈকল্যের পিছনে রয়েছে নানা কারণ ও উপাখ্যান। বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সেই প্রশ্ন থেকেই আলোচ্য গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে।

বিষয় নির্বাচনের তাৎপর্য্য : সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে যে দুটি ভারতীয় মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে বন্দিত হয়ে আছে, সে দুটি হল মহর্ষি বাল্মীকি প্রণিত *রামায়ণ* (সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীঃ পূঃ)[১] ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত *মহাভারত* (সম্ভবতঃ খ্রীঃপূঃ ৪০০- ৪০০ খ্রীঃ)।[২] ঋষি কবিদ্বয় দ্বারা রচিত বলে *রামায়ণ* ও *মহাভারতকে* বলা হয় আর্য মহাকাব্য। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* মহাকাব্যে আমরা অনেক চরিত্র দেখতে পাই। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু মহত্বমণ্ডিত ও কিছু স্বল্পখ্যাত চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই। এমন কিছু সংখ্যক মহত্বমণ্ডিত ও স্বল্পখ্যাত চরিত্র *রামায়ণ, মহাভারতে* আমরা দেখতে পাই, যাঁদের ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে অঙ্গের হানি বা আধিক্য হয়েছে। তাঁরা স্বাভাবিক মানুষের মতো কার্য সম্পাদনে সক্ষম নয়, সে অবস্থাটিকেই বোঝায় অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয়। অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয় বিষয়ে আচার্য পাণিনি বলেছেন- 'যেনাঙ্গবিকারঃ'[৩] অর্থাৎ 'যেনাঙ্গেন বিকৃতেনাঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে, ততঃ তৃতীয়া স্যাৎ'। অর্থাৎ সূত্রে 'যেন' পদের অর্থ যে অঙ্গের দ্বারা। অঙ্গবিকারঃ = অঙ্গস্য বিকারঃ অর্থাৎ যে অঙ্গের বিকৃতির দ্বারা অঙ্গির বিকৃতি লক্ষিত হয়। এছাড়া পঙ্গু শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচী হয়ে থাকে। স্ত্রীলিঙ্গবাচী পঙ্গু শব্দ বিষয়ে পাণিনি বলেছেন— 'পঙ্গোশ্চ'[৪] অর্থাৎ পঙ্গু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঊঙ্' প্রত্যয় হয়। যেমন- পঙ্গূঃ। এখানে 'পঙ্গূ' শব্দে নারী বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

এই সকল ব্যাক্তিগণের সামাজিক অধিকার পর্যালোচনা পূর্বে কীরূপ ছিল এবং তৎকালীন সমাজে এদের গুরুত্ব কতখানি ছিল, তা এই গবেষণা-সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই গবেষণার বিষয়টি চয়ন করার পেছনে বর্তমানে শব্দের মাধুর্যও গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ এই গবেষণা নিবন্ধের নামকরণে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' চয়ন করার পিছনে সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা অপরিমেয়। কারণ বর্তমানে সমাজে এই জাতীয় লোকদেরকে 'প্রতিবন্ধী' ও 'প্রতিস্পর্ধী'

নামে অভিহিত করা হয়। যার আভিধানিক অর্থ হল বাধাজনক, ব্যাঘাত, বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং বর্তমানে এই জাতীয় ব্যক্তিদেরকে প্রতিবন্ধী ও প্রতিস্পর্ধী নামে অভিহিত করলে সমাজে তারা সর্বদা সাধারণ মানুষের ন্যায় সমতার সহিত অবস্থান না করে নিম্নেই অবস্থান করবে। এছাড়াও বর্তমানে বিবিধ যানবাহনে ও লোকস্থানে এইজাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি বহুল প্রচলিত 'দিব্যাঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই 'দিব্যাঙ্গ' শব্দের দ্বারা বলা হয়, যার দিব্য অঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বরের যেরূপ দিব্য অধিক বা কম অঙ্গ রয়েছে, তেমন অঙ্গ যাঁদের, তাঁরা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি। তাদের যেকোন অঙ্গের হানি ঘটলে অথবা তাঁরা অসাধারণ বৌদ্ধিক, শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও, সমাজে এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি 'দিব্যাঙ্গ' শব্দ অত্যন্ত অপমানজনক। কারণ বর্তমানে সকল মানুষ সমাজে সমতা বজায় রেখে বাঁচতে চায়। সেই হেতু কোন ব্যক্তির অঙ্গহানির ফলে, তাঁরা বিশেষ বিশেষ কর্ম করতে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও, সমাজে সামগ্রিক অগ্রগতিতে তাঁদের বিশেষ বাধার সম্মুখীন কখনোই পড়তে হয় না। অতএব এই গবেষণা-সন্দর্ভ যেহেতু ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচিত হয়েছে এবং মহাকাব্য দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার দরুণ এই জাতীয় ব্যক্তিবিশেষকে একত্রে 'বিকৃতেন্দ্রিয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ 'বিকৃতেন্দ্রিয়' শব্দটি সমাস করলে হয় 'বিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য স' অর্থাৎ 'বিকৃত অঙ্গ রয়েছে এমন সকল ব্যক্তিবিশেষ'।

আমার গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় হল: ***বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উপলব্ধ বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান**। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচিত হয়েছে, তার সাথে একবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় অঙ্গবিকার বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অবস্থান পর্যালোচিত হয়েছে। এছাড়াও বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রগুলি আর্শীবাদ না অভিশাপস্বরূপ তার উপর আলোকপাত এবং বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রের অন্তরালে কাহিনী এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিশ্লেষণও ব্যাখাত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিকৃতেন্দ্রিয় জনগণের প্রতি সামাজিক যে অনুশাসন রয়েছে, সেগুলির পর্যালোচনা *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র,* বিবিধ *স্মৃতিশাস্ত্র* এবং *Hindu Inheritance Act* অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণানিবন্ধটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে, সেগুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : **বিকৃতেন্দ্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ।**

দ্বিতীয় অধ্যায় : ***বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* প্রতিফলিত বিকৃতেন্দ্রিয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।**

তৃতীয় অধ্যায় : **বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান।**

চতুর্থ অধ্যায় : **সাংবিধানিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা**

পঞ্চম অধ্যায় : **প্রাচীন ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষাধিকার সমূহ (Privileges)।**

কার্যপদ্ধতি: এই গবেষণা-সন্দর্ভে *বাল্মীকীয়রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারতে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় বিভিন্ন চরিত্রকে প্রসঙ্গক্রমে বিশ্লেষণ ও পুনর্পাঠ করে দেখা হয়েছে যে, তৎকালীন সময় তাঁদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ক্ষমতায়ন ও নিপীড়নের দিক দিয়ে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই পাঠের অংশ হয়েছে বিকৃতেন্দ্রিয় চরিত্রদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদান এবং বিকৃতেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় আখ্যানের যুক্তিগুলিও। গবেষণার ক্ষেত্রে আমার গবেষণার সহায়ক হয়েছে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় তৈরি হওয়া সমালোচনা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাগুলিও। মূলতঃ গুণগত গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যেই পাঠ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* সমসাময়িক বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনুশাসন প্রণালী অনুযায়ী তৎকালীন সমাজে তাদের অধিকার সুরক্ষার বিধানসমূহ আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় তৎকালীন সমাজে বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রদেশে যেভাবে জীবন ধারণ করতেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে দিয়ে কোনপ্রকার ভারী কার্য করানো নিষিদ্ধ ছিল, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের মন্ত্রণাস্থানে অপসারণ বিধি, বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ রাজার অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনের দায়িত্ব প্রণালী আলোচিত হয়েছে, পিতার ধনসম্পত্তির উপর বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের বিধান, প্রদেশের বিজিগীষু রাজা কর্তৃক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের গুপ্তচররূপে নিয়োগ প্রভৃতি অনুশাসন প্রণালী গবেষণা সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে।

পুনরায় বর্তমান ভারতীয় *ন্যায়সংহিতা* (ভারতীয় সংবিধান) অনুযায়ী বিকৃতেন্দ্রিয়ের প্রতি অনুশাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই সময় ও বর্তমান সময়েও বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি কী প্রকার অনুশাসন প্রণালী উপলব্ধ ছিল যাতে তারা সমাজে সকল মানুষের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে, তা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ বিকৃতেন্দ্রিয় মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যেসকল অনুশাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রদেশের সরকার কর্তৃক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, শংসাপত্র প্রদান, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য পৃথক্ আদালত গঠন, লোকস্থানে পৃথক্ ভবন ও শৌচালয় নির্মাণ প্রভৃতি অনুশাসন সংবিধানের পৃথক্ পৃথক্ ধারা অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া বিকৃতেন্দ্রিয় হওয়ার অন্তরালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এই অংশে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক এই তিন পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে *আয়ুর্বেদে* উল্লিখিত *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে চক্ষু, কর্ণ, অস্থি ও মানসিক অঙ্গে উৎপন্ন বিবিধ রোগের নাম, যা থেকে বিকলতার সৃষ্টি হয় তা আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রত্যেক মানুষের চোখে পাঁচটি মণ্ডল, ছয়টি সন্ধি ও ছয়টি পটল রয়েছে। এই অংশে সৃষ্ট *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষু-রোগের নাম এবং তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও আঠাশ প্রকার কর্ণ-রোগ, সাত প্রকার অস্থি-রোগ ও ছয় প্রকার মানসিক-রোগের নাম ও বৈশিষ্ট্য *সুশ্রুতসংহিতা* অনুসারে আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ *সুশ্রুতসংহিতায়* অনেকপ্রকার অস্থি ও মানসিক রোগের নাম উল্লেখ থাকলেও গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয়বর্গের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রোগের নাম ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন কুব্জ জাতীয় অস্থিরোগ মন্থরা চরিত্রের নিরিখে, খঞ্জ ও পঙ্গু জাতীয় অস্থিরোগ অষ্টাবক্র মুনি, শকুনি চরিত্রের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া পিত্তজ মূর্চ্ছারোগ রাজা দ্যুমৎসেন ও বিষজ মূর্চ্ছারোগ উপমন্যু চরিত্রের নিরিখে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত রোগের চিকিৎসা *ভৈষজ্য-রত্নাবলী* নামক আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ অনুযায়ী প্রাকৃতিক শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরিতকীবর্গ, কপূরাদিবর্গ, গুলঞ্চবর্গ ও তৈলবর্গের নিরিখে ঔষধ প্রস্তুতকরণ, তা লাগানোর উপায় এবং রোগের উপশম পদ্ধতি বিশ্লেষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে উৎপন্ন অঙ্গবৈকল্য সৃষ্টি হলেও সেই সকল অঙ্গবৈকল্যের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে কোন প্রভাব ফেলে কি না? এবিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশে আধুনিক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে মানুষের চোখে, কানে, হাড়ে ও মনে জাত বিভিন্ন রোগের নাম উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত রোগের উপশম পদ্ধতি অবলম্বনে বিবিধ ঔষধের নাম ও সেবন পদ্ধতিও বিশ্লেষিত হয়েছে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* মূলতঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলন ছিল। সেই যুগে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন সেইভাবে লক্ষিত হয়নি। কিন্তু আয়ুর্বেদ থেকেই হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উদ্ভব ঘটেছে। বিবিধ সামাজিক কুসংস্কার ও প্রকৃত চিকিৎসকের অভাবে আয়ুর্বেদ উন্নতি সাধন করতে পারে নি। সেই কারণেই হয়তো তৎকালীন সমাজে সকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতির আওতায় না আসার কারণে, তাঁরা সমাজে বিকলাঙ্গ রূপেই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে উন্নত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করার ফলে অনেক বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, আবার অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত সুস্থ না হয়েও তাঁরা কর্মক্ষমতার মাধ্যমে জীবনে এগিয়ে চলেছেন।

রাজা বা প্রদেশের মুখ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি *মনুসংহিতা* ও *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বিবাহ-বিষয়ক ব্যবস্থাগ্রহণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ ভার্যার রক্ষণ-বিষয়ক ব্যবস্থা, বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি বিষয়ক ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে। *বাল্মীকীয় রামায়ণ* ও *বৈয়াসিক মহাভারতে* উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসমূহের জীবনধারণের জন্য যেসকল বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তা ব্যাখাত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা সন্দর্ভে উল্লিখিত বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কেউ পৌরহিত্য, কেউবা পুত্র কর্তৃক ভরণ-পোষণ, কেউবা পিতা কর্তৃক ভরণ-পোষণ, কেউবা রাজকর্মচারী, কেউবা রাজা প্রভৃতি রূপে জীবন ধারণ করতেন।

আবার, বর্তমান সমাজে জীবনধারণের নিরিখে গবেষণা-সন্দর্ভে উল্লিখিত চারপ্রকার বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ, ব্রেইল লিখন ও পঠন, দৈনন্দিন জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় প্রশিক্ষণ, পরিবেশ পরিচিতি ও নিরাপদে হাঁটার কৌশল প্রশিক্ষণ, অ্যাবাকাস, রেকর্ডকৃত বই প্রভৃতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে বেঁচে থাকেন। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে Auditory Training, Lip Reading ও Speech Correction শেখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ পদ্ধতিও আলোচিত হয়েছে। অস্থিগত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য হুইল চেয়ার, ক্রাচ্ ও কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবস্থা ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক শিক্ষকের কাছে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি : বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ গবেষণা-সন্দর্ভটি 'Kalpurush' ফন্টে লেখা হয়েছে, ফন্ট সাইজ ১৪। যেখানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'Times New Roman' এর ১৪ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ সরণির মাঝে ১.১৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান করা হয়েছে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় 'Kalpurush' ফন্টে ১.২৭ সেন্টিমিটার Indent করে ফন্ট সাইজ ১২ তে লেখা হয়েছে এবং দুটো পঙক্তির মধ্যে ১ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় 'Kalpurush' ফন্টের ১২ এবং ইংরেজী ভাষায় 'Times New Roman' এর ১২ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি পৃষ্ঠার উপরে ও নীচে ২ সেন্টিমিটার এবং ডান ও বাম পাশে বাঁধাই এর জন্য ২.৫ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়া হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভের গ্রন্থপঞ্জিতে MLA8 (8^{th} Edition of the Modern Language Association's) পদ্ধতি অনুযায়ী অনুসৃত হয়েছে, যা তত্ত্বাবধায়কের সমর্থনে অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভটি রচনার নিমিত্ত সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী এবং হিন্দি ভাষায় রচিত বিবিধ পুস্তক অনুসৃত হওয়ায় সন্দর্ভটিতে গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে অভিন্নতা রক্ষার্থে ইংরেজীভাষায় Roman Diacritic Font ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থপঞ্জি 'Times New Roman' এর ১২ সাইজ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. *History of Indian Literature*, Vol- I, p. 453.

২. *তদেব,* p. 417.

৩. পা.সূ., ২।৩।২০

৪. *তদেব,* ৪।১।৬৮